জাগরণের আলোকবর্তিকা আরজ আলী মাতুব্বর

ইরানী বিশ্বাস

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সময়ে শিক্ষিত যুবসমাজ কুসংস্কারে দিক্ষিত হচ্ছে ভাবতে অবাক লাগে। বিশ্বায়নের এই যুগে ধর্মের নামে কুচিন্তা মাথায় নিয়ে একের পর এক মানুষ মারার মহোৎসবে মত্ত হচ্ছে জঙ্গিরা। এমন একটি সময়ে মনে পড়ে উত্তরাধুনিক যুগে জন্ম নেওয়া এক গরীব কৃষক সন্তান আরজ আলী মাতুব্বরের কথা। আজ থেকে ১১৯ বছর আগে ১৯০০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দেশের ভাটি অঞ্চলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সমাজব্যবস্থার মধ্যে জন্মেছিলেন তিনি। বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামের এন্তাজ আলী মাতুব্বরের ২ ছেলে মারা যাবার পর ঘর আলো করে আসেন আরজ আলী মাতুব্বর। আরজ আলীর বয়স যখন ৪ বছর তখন তার বাবা মারা যান। একটি টিনসেড বাড়ি, ৫ বিঘা জমি আর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে শুরু হয় আরজ আলীর বিধবা মায়ের জীবনযুদ্ধ। ১৯১০ সালে জমির খাজনা দিতে না পারায় এই জমিটুকুও নিলাম করে জমিদার দখল করে নেয়। বেঁচে থাকার জন্য আরজ আলীর মা সুদের কারবারি জনার্দন সেনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করেন। দেনার দায়ে ১৯১১ সালে জনার্দন সেন তাদের টিনের বসত বাড়ি নিলাম করে নেন। তবে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেননি।

লামচরি গ্রামের আবদুল করিম মুন্সী নামে এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নিজ বাড়িতে একটি মক্তব খুলেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। অক্ষর পরিচয়হীন বালকের মক্তবের আশেপাশে ঘোরাফেরা এবং পড়াশোনায় আগ্রহ বুঝতে পেরে আবদুল করিম মুন্সী আরজ আলীকে বিনা বেতনে মক্তবে ভর্তি করে নেন। পড়ালেখায় প্রবল আগ্রহ দেখে তার এক জ্ঞাতি চাচা সীতারাম বসাকের 'আদর্শলিপি' কিনে দেন। কিন্তু আরজ আলীর পড়ালেখা শুরু হতে না হতেই অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায় আবদুল করিম মুন্সীর মক্তবটি। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরজ আলী পৈত্রিক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত হন। কৃষি কাজের ফাঁকে তিনি জমি মাপজোক করা আমিনের কাজ শিখে নেন। পরে ১৯২৫ সালে কৃষি কাজের সঙ্গে আমিনের কাজ করেন। তবে থেমে থাকেনি পড়ার প্রতি আগ্রহ।

তিনি বরিশাল শহরের পরিচিত ছাত্রদের পুরনো বইপত্র সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করেন। এছাড়া পাবলিক লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক হয়ে যান তিনি। লামচরি গ্রাম থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে তিনি প্রতিদিন লাইব্রেরিতে পড়তেন। এছাড়া বরিশালের শঙ্কর লাইব্রেরি থেকে টানা ৩ বছর বই নিয়ে পড়েছেন। সে সময় খ্রিষ্টান মিশনারীদের 'ব্যাপটিস্ট মিশন' নামে একটি লাইব্রেরি থেকেও বই নিয়ে পড়তেন। এই লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকা স্কটল্যান্ডবাসী মিস্টার মরিস টানা ৬ বছর আরজ আলী মাতুব্বরকে জ্ঞান পিপাসা মেটাতে বই দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই

পড়তে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ এমন ছিল যে আরজ আলী মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে বই পড়তেন। পথ চলতে তিনি কখনো আগে হাঁটতেন না। তিনি বলতেন, পিছনে হাঁটলে চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

১৯৩২ সালে আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। বলা যায়, এটাই ছিল তার জ্ঞানালোক বিকশিত হবার উপযুক্ত সময়। এ সময় মনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে চেতনার উন্মেষ। এবছর তার একমাত্র আশ্রয় মায়ের মৃত্যু ঘটে। জীবনে সবচেয়ে আপনজনের স্মৃতি ধরে রাখতে মৃত মায়ের ছবি তুলতে চাইলেন। গ্রামের লোক তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী ছবি তোলার প্রতিবাদে তার মায়ের জানাজা বর্জন করে। তখন কাছের মানুষদের সাহায্যে মায়ের জানাজা সম্পন্ন করেন তিনি। ধারনা করা হয়, এই ঘটনা আরজ আলী মাতুব্বরের অনুভুতিপ্রবণ মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীকালে তাকে সুসংহত হতে এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চা করতে সাহায্য করে।

১৯২৩ সালে তিনি প্রথম পাঠাগার গড়ার স্বপ্ন দেখেন। বই যত্নে রাখার জন্য আলমারি কেনার সামর্থ ছিল না বলে বৈঠকখানার তাকে বই সাজিয়ে রাখতেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ সাল এই ১৮ বছরে তার বইয়ের সংগ্রহ ছিল ৯০০। কিন্তু ১৯৪১ সালে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে আরজ আলীর বৈঠকখানা এবং যত্নে সাজিয়ে রাখা পাঠাগারের সব বই উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে তিনি আশাহত না হয়ে জীবনের এই মর্মান্তিক বাস্তবতাকে পরম অভিজ্ঞতা হিসেবে মেনে নিয়ে পুনরায় বই সংগ্রহ শুরু করেন। নিরলস হাড়ভাঙা খাটুনি আর অসীম মনোবল নিয়ে পরবর্তী ১৭ বছরে বই সংগ্রহ হয় ৪০০। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আবারও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় একইভাবে উড়িয়ে নিয়ে যায় সংগ্রহ করা বই। এরপর দীর্ঘ ২১ বছর কঠিন শ্রম আর ধৈর্যের সাথে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। এবার শুধু বই সংগ্রহে মনোনিবেশ করে ক্ষান্ত হননি। ১৯৭৯ সালে বই রাখার জন্য মজবুত দালান নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি'।

আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষক কাজী নুরুল ইসলামের সহযোগিতায় একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ক্লাস নিয়েছিলেন। সেদিন শিক্ষার্থীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার লেকচার শুনেছিল। শিক্ষার্থীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। আরজ আলী মাতুব্বর কাজের তুলনায় খুবই কম সম্মাননা পেয়েছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য তাকে ডি লিট দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজনের আগেই কালিদাস ভট্টাচার্য মারা যান। বাংলাদেশ লেখক শিবির ১৯৭৮ সালে তাকে 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করে। বাংলা একাডেমি ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে তাকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে। প্রয়াত সরদার ফজলুল করিমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আরজ আলী বলেছিলেন, 'মানবতাকেই আমি একটা ধর্ম মনে করি। মানবতাই একটা ধর্ম। আমি এটা পালন করি এবং অন্যকে পালন করতে পরামর্শ দেই।' তিনি ধর্মকে কেবল একটি বিশ্বাসের রূপক হিসেবে দেখেননি, তিনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ধর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আদিম কাল থেকে মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যে জ্ঞানজিজ্ঞাসা লালন করে, তিনি সেই জ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন। আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার পথিকৃৎ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে মৌলবাদীদের উত্থানপর্বের বৈরী সময়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার নায়ক।

আরজ আলী মাতুব্বর অসীম নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের সাথে ৩০ বছরেরও অধিক সময়কালে এগারোটি পাণ্ডুলিপি রচনা করে গেছেন। এর মধ্যে তার জীবদ্দশায় তিনটি বই এবং একটি সংকলন 'সত্যের সন্ধান', 'অনুমান', 'সৃষ্টি রহস্য' ও 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হয়। তার মৃত্যুর পর ৬টি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'সীজের ফুল' (কবিতা), 'জীবন বাণী' (আত্মজীবনী), 'ভিখারীর আত্মকাহিনী' (আত্মজীবনী), 'কৃষকের ভাগ্যগ্রহ' (প্রবন্ধ) এবং 'বেদের অবদান' (প্রবন্ধ)।

১৯৬০ সালে ৬০ বছর বয়সে আরজ আলী তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করেন। তবে তিনি তার সন্তানদের জানান, মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে উপার্জিত অর্থ তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করবেন। শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি অপার স্নেহ-ভালবাসা থেকে তিনি 'আরজ ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে প্রতিবছর শিশুদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। ১৯৮১ সালে আরজ আলী মাতুব্বর সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে নিজের মৃতদেহ বরিশাল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতির জন্য দান করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান।